প্রথাভাঙা ৬ চলচ্চিত্রকার

প্র থা ভা ঙা

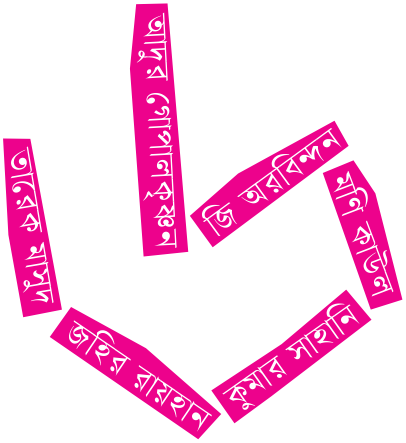

চলচ্চিত্রকার

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

প্রথাভাঙা ৬ চলচ্চিত্রকার
চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ২০০ টাকা

Prothabhanga 6 Cholocchitrokar by Chandi Mukherjee Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: September 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97729-7-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

যে মানুষ দেখা হলেই মেতে উঠতেন সিনেমা-তরজায়
সেই চিরতরুণ মৃণাল সেন-কে

ভূমিকা

নিজস্ব জগতে একা কিন্তু অন্যন্য। ভারত বাংলাদেশ মিলিয়ে একক ছজন চলচ্চিত্র পরিচালক। যারা নিজেরাই নিজের অনন্যতায় হয়ে উঠেছেন আন্তর্জাতিক। বাংলাদেশের জহির রায়হান ও তারেক মাসুদ। আর ভারতের চারজন—জি অরবিন্দন, আদুর গোপালকৃষ্ণন, মণি কাউল ও কুমার সাহানি। এদের নিয়েই এই গ্রন্থ। আইডিয়াটা প্রকাশক বন্ধু সজল আহমেদের। তার উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা ছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হতো না। এই গ্রন্থ রচনায় দেশি-বিদেশি নানা গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সেইসব বইয়ের লেখককুলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ভারতের এই চার পরিচালকের সঙ্গেই আমার সাংবাদিকতাসূত্রে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় ছিল বা আছে। সেই অভিজ্ঞতার ছোঁয়া আছে এই বইতে। আর আন্তর্জালের সুবাদে জহির এবং তারেকের প্রায় সব ছবিই দেখেছি। সেই সূত্রে এদের আবিষ্কার করতে সুবিধেই হয়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই গ্রন্থনির্মাণে যারা জড়িয়ে রইলেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ।

কলকাতা

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

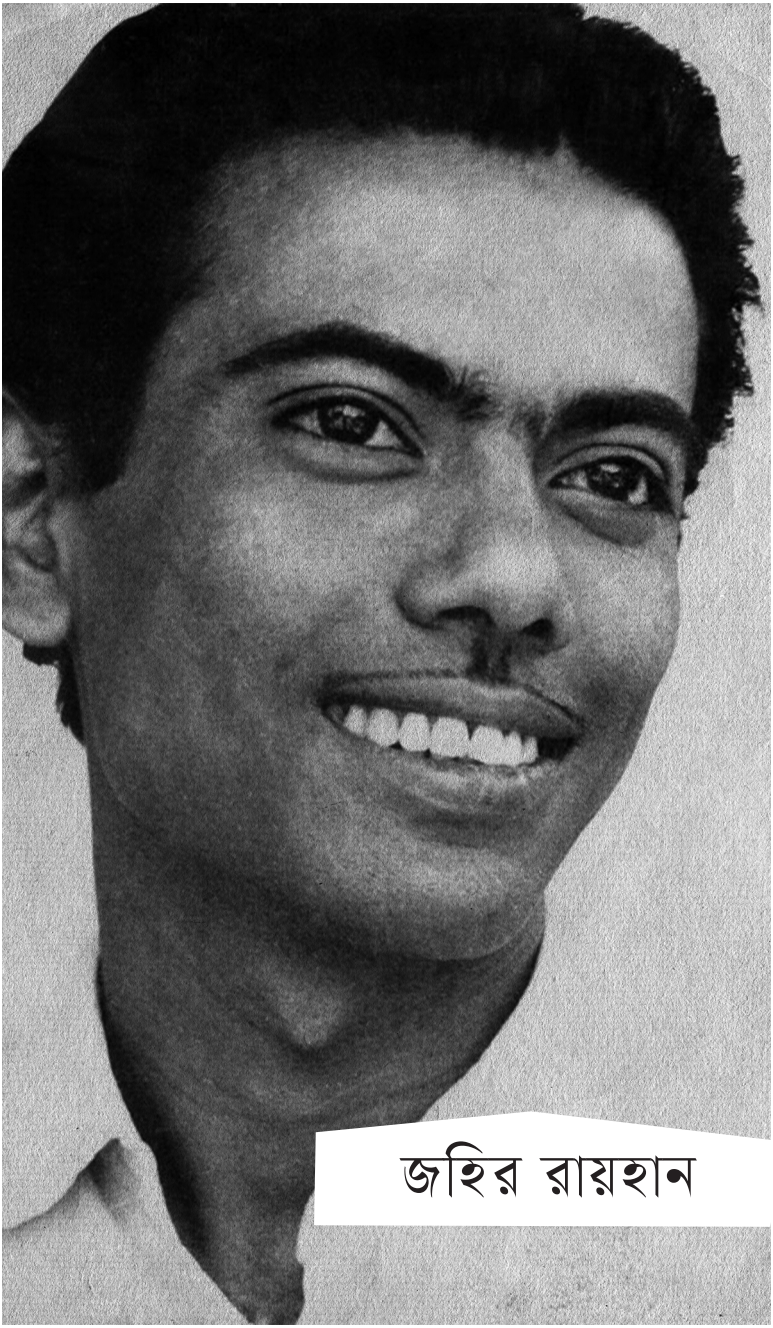

জহির রায়হান

জহির রায়হান

জহির রায়হান একজন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র পরিচালক এবং প্রযোজক। এই কি তাঁর পরিচয়? এর বাইরে রয়েছেন আরেক জহির। যাঁর বিনোদন ও সাহিত্যজগৎ ছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছিল তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ। যিনি রাজনৈতিক জহির রায়হান। বাংলা ভাষার জন্য যিনি বাজি রাখেন নিজের জীবনকে। সাহিত্য বা সিনেমা যাই হোক না কেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি বাঙালির ওপর অত্যাচারকে প্রতিবাদ করেছেন কখনো কলম বা কখনো ক্যামেরা দিয়ে। মাত্র ৩৭ বছর তাঁর জীবনকাল। এটা এভাবে বলা অবশ্য ঠিক নয়। কেননা তাঁর মৃত্যুর কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। তিনি তাঁর ভাইকে খুঁজতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। শহিদ জহির রায়হানের সাঁইত্রিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছেন বাঙালির মহত্তম দুই ঘটনায়—ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ। তাই ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর গল্প, উপন্যাস, সিনেমায় ও সাংগঠনিক সক্রিয়তায় বারবার ফিরে ফিরে আসে। কিন্তু অল্প আয়ু জীবনের মধ্যেই তিনি নিজ ক্ষেত্রে অর্জন করেছেন অমরত্ব। তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের সিনেমার পুরাণপুরুষ। তাঁর চলচ্চিত্রজীবনে তিনি নির্মাণ করেছেন সাতটি বাংলা, তিনটি উর্দু, এইসব মিলিয়ে দশটি ফিচার এবং দুটি তথ্যচিত্র। অবশ্য সাতটি ফিচারের মধ্যে একটি অসমাপ্ত। তাঁর কর্মই তাঁকে বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে অমর করেছে। শুধু মুক্তিযুদ্ধ নয় সেই পঞ্চাশের প্রথমে ভাষা আন্দোলনের সময়েও তিনি ছিলেন সমান সক্রিয়। কতই বা বয়স তখন তাঁর। সতেরো ছুঁই ছুঁই। কিশোরকাল আর যৌবনকালের মাঝামাঝি। জহির রায়হানের জন্ম ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট। নোয়াখালী (বর্তমানে ফেনী) জেলার মজুপুর গ্রামে। তখনও তো ভারত ভাগ হয়নি। বাবা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ এবং মা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন। আট ভাইবোনের সংসারে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান। তাঁর আসল নাম আবু আবদাল মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ এবং ডাকনাম জাফর। কিন্তু সংস্কৃতিজগতে এসে নাম নেন জহির রায়হান। জাফরের বাবা কর্মসূত্রে থাকতেন কলকাতায়। এক আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার কারণে তিনি সপরিবারে কলকাতায় থাকতেন। চল্লিশ দশকের শুরুতে কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউটে পড়াশুনা করছেন জহির রায়হান। মধ্যরাত্রির স্বাধীনতা ও দেশভাগের ফলে তাঁরা

১৯৪৭ সালে সপরিবারে ঢাকায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। চল্লিশের কলকাতায় জহিরের বালককাল কাটছে। রবীন্দ্রনাথ যখন মারা যাচ্ছেন তখন জহির ছবছরের বালক। ঝাপসাভাবে তাঁর স্মৃতিতে রয়ে গেছে সেই দিন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যভাবনাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। এ কথা নিজেই স্বীকার করেন জহির। ২২ শ্রাবণে সারা কলকাতা কেঁদেছিল। বাবার হাত ধরে কবির শেষযাত্রা দেখেন তিনি। বিশাল এক জনসমুদ্র। তার মধ্যে ভেসে যাচ্ছেন কবি।

রাজনীতির পাঠ কলকাতাতেই। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কলকাতায় ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ার সময় বড় ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রভাবে জহির রায়হান প্রথম রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। এসময় তিনি পার্টির হয়ে কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকা বিক্রি করতেন। ছোটবেলা থেকেই বই পড়া ও লেখালেখির দিকে তাঁর বিশেষ টান দেখা যাচ্ছিল। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি যখন হাই স্কুলের ছাত্র, তখন 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় 'ওদের জানিয়ে দাও' নামে প্রথম তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। পার্টি মহলে এটি বেশ জনপ্রিয় হয়। তৎকালীন নিরীহ বাঙালিদের ওপর ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই ছিল এই কবিতার বিষয়। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর বাবা কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। জহির নোয়াখালী গ্রামের বাড়ি চলে যান। সেখানে আমিরাবাদ হাই স্কুল থেকে ১৯৫০ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক এবং ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৫৩ সালে আইএসসি পাস করেন। এরপর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ডাক্তারি পড়তে তার ভালো লাগছিল না। তিনি ডাক্তারি ছেড়ে বাংলায় অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৫৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বিএ অনার্স পাস করেন। কিছুদিন এমএ পড়াশোনা করলেও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা না দিয়েই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। পাশাপাশি সাংবাদিকতাও। সেই সময়ের কথা উঠে আসে এক সাক্ষাৎকারে, "ষাটের দশক কিন্তু বিভিন্ন কলামিস্ট তৈরি করতে শুরু করল। আমরা দু-একজন ছিলাম তার বাইরে আনোয়ার জাহিদ, জহির রায়হান, আহমেদুর রহমান (ভীমরুল নামে) আরও কয়েকজন ছিলেন। জহির রায়হান একটা পত্রিকা বের করলেন ষাটের দশকে, সাপ্তাহিক 'প্রবাহ' নামে। বেশিদিন বাঁচেনি, কিন্তু দারুণ কাগজ ছিল। মার্শাল ল' আসার পর আমাদের বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতার নতুন মোড় এলো, কতটা নিজেকে বাঁচিয়ে কিন্তু আসল কথাটা বলতে হবে। সাহিত্যের ব্যাপারটা অনেকটা আড়ালে আবডালে চলে গেল। প্রত্যক্ষ ভাষা তার পরোক্ষ হয়ে গেল। কিন্তু বিষয়বস্তুটা এক রইল, এটা উর্দুভাষীদের মোটা মাথায় ঢোকেনি। পাঞ্জাবি শাসকদের মোটা মাথায় যখন ঢুকতে শুরু করল তাদের বাঙালি অনুচররা বোঝাল লেখাটা এই রকম যখন তখন তাদের বিরুদ্ধে শুরু হলো নির্যাতন, যেমন—আহমেদুর রহমানকে তারা কালো তালিকাভুক্ত করেছিল, আরও অনেককে করেছিল। আমাকে তো যেতেই দিল না, একবার আমি ইরানে আমন্ত্রণ

পেয়েছিলাম তাও সিয়াটোর আমন্ত্রণ, আমাকে বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেয়া হলো। এভাবে আহমেদুর রহমানের পাসপোর্ট সিজ করা হয়েছিল। বহু তদবিরের পর তাকে কায়রোতে যেতে দেয়া হলো ১৯৬৫ সালে। That was is first and last. ১৯৬৫ সালে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। আহমেদুর রহমান মারা যাওয়ার পর বস্তুত আমি, মঈদুল হাসান এরকম দু-একজনই মাত্র কলামিস্ট রাজনৈতিক কলামটি মুখ্য হয়ে ওঠে। এবং এজন্য আমাদের বহু কষ্ট করতে হয়েছে। অবশ্য বাঙালি জেনারেলদের শাসনামলে কলামিস্টরা যে কষ্ট করেছে তার চেয়ে অনেক কম কষ্ট ছিল। প্রচুর কষ্ট তখনও করতে হয়েছে। পত্রিকার সংখ্যা কম ছিল, বেতনও কম ছিল। সাংবাদিক পরিচয় দিলে বিয়ে করার জন্য কেউ মেয়ে দিতে চাইত না। খুব সমস্যার ভিতর দিয়ে আমাদের এগোতে হয়েছে।"

একবার মুনতাসীর মামুন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীকে প্রশ্ন করেন, "আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, '৬০ থেকে '৭০ পর্যন্ত বিভিন্ন যে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো হয়েছে সেগুলোতে আপনার সম্পৃক্ততা ও আপনাদের সহকর্মীদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি জানতে চেয়েছিলাম, '৭১ সাল পর্যন্ত। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি আগেও বলেছিলেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে আপনার যোগাযোগ ছিল। আমি সামগ্রিকভাবে এ বিষয়টি সম্পর্কে আপনার স্মৃতি কাহিনিটি জানতে চেয়েছিলাম।" এর উত্তরে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বলেন, "ষাটের দশকের গোড়ার দিকে যে আন্দোলন আমরা করেছি সেটি হলো রোমান হরফে বাংলা লেখার বিরুদ্ধে সেটা মুনীর চৌধুরীর নেতৃত্বে হলো। রোমান হরফের পরে রবীন্দ্রসংগীত। চল্লিশ চোরের কাহিনি আবুল মনসুর আহমেদ থেকে শুরু করে অনেকে মিলে রবীন্দ্রসংগীতের বিরুদ্ধে সৈয়দ আলী আহসানরা বিবৃতি দিয়েছে বলে আমার মনে আছে। এই বিবৃতির বিরুদ্ধে তো আমাদের আন্দোলন করতে হয়েছে। এই আন্দোলটিতেও হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান এই গ্রুপটি আন্দোলন করে। এই সময় রবীন্দ্রসংগীত আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যে কেন তাকে রক্ষা করবে এই নিয়ে আমাদের প্রচণ্ড লেখালেখি করতে হয়েছে। এই আন্দোলনের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত ছিলাম। এই সময় মওলানা আকরাম খাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, কারণ আমি তখন আজাদে চাকরি করতাম। খুবই বিশ্বাসের কথা, আমার বিরুদ্ধে বহু দুর্নাম ছড়ানো হয়েছে রবীন্দ্রসংগীতের আন্দোলনে ছিলাম বলে, কিন্তু মওলানা আকরাম খাঁ খুব সাম্প্রদায়িক নেতা হওয়া সত্ত্বেও আমাকে বলেছিলেন তোমাকে রবীন্দ্রসংগীতের বিরুদ্ধে লিখতে হবে না আজাদে এবং আমি কখনো লিখিনি—এটা আমি পরিষ্কারভাবে বলতে পারি। কারণ রবীন্দ্রসংগীত ছিল আমার জীবনের একটা প্রবাহ। এই সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটে, যে ফয়েজ আহমদ পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে আমাদের প্রগতিশীল সাহিত্য সংস্কৃতির আন্দোলনটা ছিল এটা, আকরাম খাঁ আসার কথা। সবাই ভয় পেয়ে গেল মওলানা আকরাম খাঁ কি

আসবেন, মওলানা আকরাম খাঁ সে সময় আসলেন। এসে তিনি যে ভাষণটা দিলেন এটা ছিল আরও বিস্ময়কর। তিনি বললেন, ভাব যদি প্রকৃত মূর্তি ধারণ করে তাকেও আমাদের সাহিত্যে স্থান দিতে হবে। কাগজে বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল। এই যে লোকটি বিস্ময়কর-কন্ট্রাডিক্টরি চরিত্র মওলানা আকরাম খাঁর। নিজে তেমন নামাজ রোজা করতেন না। তার মোস্তফা চরিত্রের মধ্যে নবির জীবন মুক্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, তার কোরানের তফসির লেখার ফলে লালবাগ মসজিদ থেকে মুরতাদ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু আবার প্রচণ্ডভাবে ভারতবিদ্বেষী ছিলেন। আজাদ পত্রিকায় তিনি ইসলামি বাংলা ভাষা লেখার প্রচণ্ড চেষ্টা করতেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল। রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলনে তার কাগজে মুজিবর রহমান খাঁ, সৈয়দ আলী আহসানরা যতটা উৎসাহী ছিলেন তিনি ততটা উৎসাহী ছিলেন না। তার ফলে আমরা অনেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথের আন্দোলনের পরে যে আন্দোলনটি হয় সেই আন্দোলনটি হলো ৬ দফার আন্দোলন। ৬ দফা আন্দোলনে আমি যেটা বলব সত্য কথাই বলব কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করবে না। কেউ বিশ্বাস করবে না পরবর্তীকালে অনেকে বলে যে, এটা গাফ্‌ফার চৌধুরী বানিয়ে বলেছে। তবু আমি বলে রাখি—এটা রেকর্ড থাক—এবং এখনও অনেকে মিথ্যে কথা বলেন যে, ৬ দফাটা শেখ মুজিবুর রহমানের তৈরি নয়।" এই দুটি সাক্ষাৎকার থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জীবন ও সময় অনেকটাই স্পষ্ট হয়। বোঝা যায় জহির রায়হানের যৌবন জীবনের পটভূমি।

চলচ্চিত্রজগতে আসার আগে, মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়েই তিনি সরাসরি সাহিত্যজগতে জড়িয়ে পড়েছেন। এ কথা আমরা জানতে পারি আসরাফ সিদ্দিকির এক স্মৃতিচারণ থেকে, "কখন প্রথম দেখা হলো অমর কথাশিল্পী জহির রায়হানের (শহিদ) সঙ্গে? হ্যাঁ—তিনি তখনও অমর হননি, সাহিত্যের আসরে গতায়াৎ শুরু হয়েছে মাত্র। দেখা হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজের শহিদ মিনারের দিকের তখনকার অস্থায়ী বাঁশের বেড়া দেয়া শেড়ে, যেখানে থাকতেন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক শহিদ আলিম চৌধুরী, তখন অবশ্য মেডিকেলের উপরের শ্রেণির সিনিয়র ছাত্র, যিনি জহির রায়হানেরই আত্মীয়, মেডিকেল কলেজের সতীর্থ এম. এ. কবীরের সঙ্গে বের করতেন 'খাপছাড়া', 'যাত্রিক' প্রভৃতি পত্রিকা। সেসব পত্রিকায় আমিও লিখেছি নিয়মিত। জহির সেখানে আসতেন পরিধানে পাজামা-শার্ট, বেঁটেখাটো মানুষটি গল্প করতেন, বেশ কিছুটা লাজুক, পড়তেন সম্ভবত জগন্নাথ কলেজে। 'আই বলয়' প্রকাশিত হয়। যতদূর জানতে পেরেছি ঐ 'খাপছাড়া' অথবা 'যাত্রিক' পত্রিকায়। জহির এই পত্রিকা দুটির ব্যাপারে, যতদূর মনে পড়ে পরিশ্রমও করতেন, কারণ মেডিকেলের উপরের শ্রেণির দুজন সিনিয়র ছাত্রের কারও পক্ষেই প্রেসে দৌড়ঝাঁপ, লেখা জোগাড় বা প্রুফ দেখা সম্ভবত সম্ভব ছিল না। মরহুম ড. চৌধুরী ছিলেন যদিও সম্বন্ধে আমার চাচাশ্বশুর, তবু তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন,

বন্ধুর মতোই ব্যবহার করতেন আমার সঙ্গে, প্রায় সময়ই থাকতেন আমার শ্বশুরালয়ে, ৩৭ নাজিমুদ্দিন রোডে যেখানে হন্তদন্তভাবে প্রুফ বা লেখাসহ কখনো দেখা যেত জহিরকে। পরিচয় হয়েছিল আমার স্ত্রীর ছোট ভাই লতিফ চৌধুরীর সঙ্গে, যিনি ভাষা আন্দোলনের সময় সম্ভবত ছিলেন কারাসঙ্গী। জহিরকে তখনই মনে হতো খুব ব্যস্ত, হাতে যেন কত কাজ, এতটুকু যেন সময় নেই। এরপর দেখা হয়েছে সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজের (মরহুম) জনসন রোডের 'চিত্রালী' অফিসে, '৫৮ বা '৬০-এ, তখনও খুব ব্যস্ত, পাজামার বদলে তখন প্যান্ট হাওয়াই শার্ট। তবে পোশাক পরিচ্ছদের দিকে, যতদূর মনে পড়ে, খুব সজাগ মনে হতো না। এরপর ১৯৬৯-৭০ এর শেষের দিকে, সেই উত্তাল গণঅভ্যুত্থানের দিনগুলোতে হঠাৎ করেই এলেন, চিরাচরিত ব্যস্তসমস্ত, ১০নং গ্রিন রোডের বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে, কয়েক বছর পূর্বের দৈনিক বাংলা পত্রিকা এবং একুশে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে প্রাচীন তথ্যপঞ্জি ঘাটতে। আমি বোর্ডের পরিচালক। গবেষণা বিভাগের শ্রদ্ধেয় আলী আহমদ সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো—কতদিন এসেছিলেন, কখন আসতেন খবর রাখা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত কোনো ফিল্মের কাহিনির ব্যাপারে তথ্য প্রয়োজন ছিল, কী সে প্রয়োজন—কাল মিলিয়ে ভবিষ্যতের কোনো গবেষক নিশ্চয়ই খুঁজে বের করতে পারবেন।" এইসবের পাশাপাশি তিনি জড়িয়ে পড়ছেন কিশোর বয়স থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক থাকাকালীন তাঁর লেখায় রাজনৈতিক ভাষ্য ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে উঠত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নিয়ে পড়াশোনাকালীন তিনি ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন।

সিনেমাসত্তার পাশে জহিরের এক সাহিত্যসত্তা রয়েছে। সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে সমান পারদর্শী ছিলেন তিনি। যেমন চলচ্চিত্রকার জহির তেমন জহির রায়হান নামটার সঙ্গে অনেকেই আবার পরিচিত তাঁর লেখা 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস পড়ার মাধ্যমে। স্কুলপাঠ্য হিসেবে নবম-দশম শ্রেণিতে এই উপন্যাসটি সিলেবাসের মধ্যে ছিল। কিন্তু তিনি কেবলই একজন ঔপন্যাসিক নন। তিনি ছোটগল্পকার। স্বল্পায়ু তাঁর সাহিত্যজীবন। আটটি উপন্যাস এবং একটি গল্পগ্রন্থ। বাংলাদেশের আধুনিক বাংলা সাহিত্য কিংবা আধুনিক বাংলা সিনেমায় যদি একসঙ্গে কারও নাম উঠে আসে তাহলে প্রথমেই আসবে জহির রায়হানের নাম। তিনি একাধারে ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকার। জহির রায়হান একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য তাঁর কলম থেকেই যাত্রা শুরু করে। মাত্র আটটি উপন্যাস। 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (প্রথম উপন্যাস, ১৯৬০)। রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যান। 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪)। আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে রচিত আখ্যান। 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৯)। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯)।

অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের অসহায়ত্ব গাথা। 'আর কতদিন' (১৯৭০)। অবরুদ্ধ ও পদদলিত মানবাত্মার আন্তর্জাতিক রূপ এবং সংগ্রাম ও স্বপ্নের আত্মকথা। 'কয়েকটি মৃত্যু তৃষ্ণা' (১৯৬২)। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (১৯৭০)। সঙ্গে কিছু গল্প ও প্রবন্ধ লিখেই তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখক হয়ে ওঠেন। তাঁর রচনাগুলো ছিল জীবনমুখী। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'হাজার বছর ধরে' প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। এ উপন্যাসে গ্রামের প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রাকে তিনি অসম্ভব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া শহুরে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনি তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর আরেক উপন্যাস 'বরফ গলা নদীর' মাধ্যমে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি রচনা করেন 'আরেক ফাল্গুন' এবং 'একুশে ফেব্রুয়ারি' নামের দুটি উপন্যাস।

১৯৫৭ থেকে ১৯৭১। জহির রায়হানের চলচ্চিত্রজীবন। নিজের পরিচালনায় ছবি করেছেন ১৩টি কাহিনিচিত্র, ২টি তথ্যচিত্র। প্রযোজনা, চিত্রনাট্য, সহকারী পরিচালক ইত্যাদি ধরলে তাঁর ছবির সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৩০। চৌদ্দ বছরে তিনি ৩০টা ছবির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। নিরুদ্দেশ না হয়ে গেলে অবশ্য সংখ্যা আরও অনেক বাড়ত। স্কুল পাস করার পরেই সিনেমা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। খুব অল্প বয়স থেকেই সিনেমাজগতের প্রতি তাঁর আলাদা ভালোবাসা তৈরি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে সরাসরি জড়িয়ে থাকেন বিভিন্ন নাট্যকর্মশালার সঙ্গেও। কলেজে পড়ার সময় পড়া মাঝপথে থামিয়ে তিনি সিনেমা শেখার টানে কলকাতা চলে যান। সিনেমার প্রতি ভালোবাসা থেকে তিনি কলকাতার প্রমথেশ বড়ুয়া ফিল্ম স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু অর্থাভাবে দশ মাসের কোর্স মাত্র ছমাস করেই ফিরতে হয় তাঁকে। দেশে ফিরে পরবর্তীকালে এই সিনেমার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। সদ্য কলেজের পাঠ শেষ করে তিনি বাংলাদেশের সিনেমাজগতে সহকারী পরিচালক হিসেবে ঢুকে আস্তে আস্তে হাতেকলমে চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে করায়ত্ত করে নিজেই চলচ্চিত্র পরিচালক হয়ে ওঠেন। ক্রমে চলচ্চিত্র প্রযোজকও। চলচ্চিত্র নির্মাণে তিনি অতিদ্রুত হয়ে ওঠেন জহির রায়হান। তাঁর সিনেমা হয়ে ওঠে সর্বজনীন। আন্তর্জাতিক সিনেমা বোদ্ধা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, চলচ্চিত্রের কড়া সমালোচক থেকে খেটে খাওয়া মানুষ, শহুরে মধ্যবিত্ত থেকে গ্রামীণ সমাজ, মেলোড্রামা থেকে আন্তর্জাতিক পরিসরে বার্তা পৌঁছে দেয়া প্রামাণ্যচিত্র—সবকিছুতেই তাঁর অসাধারণ দখল। সিনেমাজগতে তাঁর প্রথম জড়িয়ে পড়া ১৯৫৭ সালে 'জাগো হুয়া সাভেরা' নামের এক উর্দু সিনেমাতে। সহকারী পরিচালক হিসেবে। 'জাগো হুয়া সাভেরা' ছবির পরিচালক ছিলেন আখতার জং কারদার। ১৯৫৭ সালে ছবিটির নির্মাণকার্য শুরু হয়। পাকিস্তানি চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯৫৯ সালে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের